স্পট চট্টগ্রাম

অস্ত্র ব্যবসার ট্রানজিট

ধরাছোঁয়ার বাইরে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছে শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ট্রানজিট। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন গোয়েন্দা এবং পুলিশ প্রশাসন। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তারকৃত সর্বশেষ অস্ত্র ক্রেতা বান্দরবানে আটক ৫ যুবকের মধ্যে ৩ যুবকের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। ২ শিবির ক্যাডার এবং ১ যুবদল ক্যাডার (৮ জুন ২০০৩ দৈনিক পূর্বকোণ)। এরা নগদ ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ৩টি মোবাইল এবং মাইক্রোসহ গ্রেপ্তার হয় বান্দরবানে। সরকারের বিশেষ সংস্থা নিশ্চিত এরা অস্ত্র আমদানির মিশন নিয়ে বান্দরবান এসেছিলো। আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন বান্দরবান জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী মাহাতুল হোসেন যত্ন।

গত ৯ জুন চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার শুলকবহর থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় সাইদুর রহমান (২৭), পিতা মোঃ ইউনুস, রোড-১২, বি-ব্লক, চান্দগাঁও আ/এ। গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ, সাইদুরের মামা সলিমউল্লাহ মিয়ানমারভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মির কমান্ডার ইন চিফ। সাইদুরের সঙ্গে তার অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গী আমানউল্লাহকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তবে রহস্যজনক কারণে এ বিষয়টি গোপন রাখছে সিএমপি গোয়েন্দা শাখা।

২০০০ সালে নগরীর চান্দগাঁও এলাকা থেকে আরাকান ন্যাশনাল আর্মির ম্যানিফেস্টো, ইসলামী দাতা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ ও দুস্থদের চিকিৎসা দানের ছবি, অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ তোলা অসংখ্য ছবি, কম্পিউটারসহ কমান্ডার ইন চিফ সলিমউল্লাহ গ্রেপ্তার হন। তারই ভাগ্নে সাইদুর চান্দগাঁও, বহদ্দারহাট এলাকার অস্ত্র ব্যবসায় সক্রিয় বলে সূত্রে প্রকাশ। সলিমউল্লাহ গ্রেপ্তারের দু'মাস পরই জামিন পেয়ে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে তার বিদ্রোহী সশস্ত্র গ্রুপের দলীয় কর্মকান্ড।

অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ২ থেকে ৩ সৈন্যবাহিনী রয়েছে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল আর্মির দুই গ্রুপে। উল্লেখ্য, RNA (ARIF) এবং RSA এই দুই গ্রুপের অস্তিত্ব কক্সবাজার-উখিয়া সীমান্তে নিশ্চিত হয়েছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ। গভীর পাহাড়ি অরণ্যে এদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ এবং সামরিক মহড়া চলে নিয়মিত। RNA গ্রুপের কমান্ডার ইন চিফ মোহাম্মদ সলিমউল্লাহ মূলত ঢাকা এবং চট্টগ্রামে থেকেই অস্ত্রের বেচাকেনাসহ তার বিদ্রোহী গেরিলা গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। অন্য গ্রুপটিও রোহিঙ্গা সলিডারিটি নামে একই কাজ করে যাচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি সমুদ্র পথে মংলা বন্দরে অস্ত্রের চালান নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকজনের গ্রুপ। চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় গত ২০ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আটক হয়। এরা প্রত্যেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বলে স্বীকার করেছে। যারা অস্ত্র প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী

২০০০ সালে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিরঞ্জন পালিতের নেতৃত্বে দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আটক হয় এই গেরিলা সংগঠনটির কিছু সদস্য। নগর গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় গ্রেপ্তার হয় মোঃ সলিমউল্লাহ। তখন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। এখন বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন সরকার এ বিষয়ে রহস্যজনক ভূমিকা দেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তদন্তকারী কর্মকর্তা এন পালিতের তদন্ত রিপোর্টের বিশাল ফাইল তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়েও কারো উৎসাহ দেখেননি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই চট্টগ্রাম বন্দর থানার তৎকালীন এসি নিরঞ্জন পালিতকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয় উত্তরবঙ্গে। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর স্বেচ্ছা অবসর এবং ক্লিনহার্ট অপারেশনের সময় ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার হয় দুঃসাহসী পুলিশ কর্মকর্তা এন পালিত।

অন্যদিকে ২০০০ সালে গ্রেপ্তারের দু'মাস পরই হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত সলিমউল্লাহ বীরদর্পে চালিয়ে যাচ্ছে তার অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, গেরিলা সশস্ত্র দলের কাজ।

কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নীরবে চোখের জল ফেলছেন নিরঞ্জন পালিত। তার তদন্ত রিপোর্টের খোঁজ কেউ জানে না।

এদের প্রত্যেকের হাতের অটোমেটিক অস্ত্র কোনো ত্রুটি বা একটু পুরনো হলেই এরা বেচে দেয় স্থানীয় অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে। এক থেকে দেড় লাখ টাকায় প্রতিটি অটোমেটিক অস্ত্র বিক্রি হয় আন্ডারওয়ার্ল্ডে। অনেক সময় গ্রুপ থেকে পালিয়ে গিয়ে অস্ত্র বেচে দেয় অনেক বিদ্রোহী গেরিলা।

রোহিঙ্গা গেরিলা গ্রুপ দু'টির বিদ্রোহী সদস্যদের প্রত্যেকের হাতে একটি কার্ড থাকে। এই কার্ড দেখিয়ে তারা রাজনৈতিক আশ্রয় পায় মধ্যপ্রাচ্যে। যাবার আগেই তারা অস্ত্র বিক্রি করে নগদ টাকা হাতে নেয়। একই সঙ্গে গোপন চুক্তি করে নেয় মধ্যপ্রাচ্যের কোনো প্রবাসীর সঙ্গে কোনো ব্যবসার। যাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয় এবং ব্যবসা তাদের জন্যে নিশ্চিত।

কক্সবাজারের উখিয়া বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, ইটগড়, চন্দ্রঘোনার লিচুবাগান, পটিয়া অস্ত্র চোরাচালানের প্রধান রুট।

গত চার-পাঁচ বছর থেকে উত্তরবঙ্গের চরমপন্থি গ্রুপগুলোতে অত্যাধুনিক অস্ত্রের চালান যাচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে। গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ, সাম্প্রতিক পুলিশের হাতেও অত্যাধুনিক অস্ত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের চরমপন্থিদের আন্ডার ওয়ার্ল্ডে অত্যাধুনিক অস্ত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে মারাত্মক হারে। চরমপন্থিদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে গ্রুপিং, বেড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিপক্ষ গ্রুপকে ক্ষমতা দেখাতে অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া উত্তরবঙ্গের আন্ডারওয়ার্ল্ডে জরুরি হারে পড়েছে। যা আগের মতো ভারত সীমান্ত পথে আসা বা পুলিশের থেকে লুঠ করা অস্ত্রে সম্ভব হচ্ছে না বলে গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ এ অস্ত্র সরবরাহের রুট পরিবর্তন হয় প্রায়ই। তবে মূলত চট্টগ্রাম-ঢাকা- আরিচা, যাত্রাবাড়ী মাওয়া। ঢাকা শহরের দিকে এ অস্ত্রের সরবরাহ না গিয়ে সরাসরি উত্তরবঙ্গে চলে যায়। ছড়িয়ে যায় চরমপন্থিদের হাতে।

খুলনার রূপসা, বাগেরহাট, যশোরের রহমাননগর, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এই রুটের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের আস্তানা।

আবুল কাশেম চৌধুরী- চট্টগ্রাম বেল্ট এবং আন্ডার ওয়ার্ল্ডে বারবার অস্ত্র ব্যবসায় যার নাম সবার আগে আসে- ফটিকছড়ির কাঞ্চননগর উপজেলার চেয়ারম্যান আবুল কাশেম চৌধুরী। সন্ত্রাসের গডফাদার এবং প্রতিষ্ঠিত অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা এবং সকল মহলে পরিচিত নাম। যার টিকিটিও ছোঁয় না পুলিশ। সাবেক এক পুলিশ সুপার তার বিদায়ী ভাষণে স্পষ্টভাবে কাশেম চৌধুরীর নামে অব্যাহত সন্ত্রাস, অপহরণ এবং অস্ত্র ব্যবসার অভিযোগ তুলে তাকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থতার সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে প্রশাসনে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন। তবু এখনো ভারত-পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চল ফটিকছড়ির কাশেম

অস্ত্রের বাজার দর

১. একে-৪৭, একে-৫৬, এম-১৬ - দেড় থেকে দুই লাখ টাকা। (সহজলভ্য হয়ে পড়েছে চোরাচালানে মিয়ানমার থেকে)।

২. সিজেট পিস্তল - এক লাখ টাকা।

৩. পিস্তল (অস্টা) (ইউএসএ)- ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা।

৪. পাকিস্তানি রিভলবার- ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

৫. থ্রি নট থ্রি- ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা।

৬. বিদেশী একনলা/দোনলা - ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা। (চাহিদা কম)

৭. কাটা রাইফেল - ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

৮. দেশী বন্দুক- ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা।

(স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রামের প্রায় এলাকায়ই তৈরি হচ্ছে) শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য।

সিএমপি নগর গোয়েন্দা শাখার এসি শফিকুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে মূল অপরাধী অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। কাশেম চেয়ারম্যান, নজরুলের মতো অস্ত্র ব্যবসায়ীরা মামলার অভাবে গ্রেপ্তার হয় না। মামলা থাকলেও তারা জামিন পেয়ে যায়।'

চেয়ারম্যান দোর্দন্ড প্রতাপে তার নীল নকশার বাস্তবায়ন করে চলেছে। আদিবাসী গেরিলা শিবির ক্যাডার নাছির, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকা চৌধুরী, সুইডেন আসলাম থেকে চরমপন্থিদের আবদুর রশীদ তপন। সবার চেনা নাম আবুল কাশেম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু হত্যা এবং অস্ত্র মামলার মধ্যে কিছু মামলার কোনো তদন্তই হয়নি। ফলে সন্ত্রাসের গডফাদার হয়েও বেঁচে যাচ্ছে বারবার।

নজরুল- উখিয়ার জামায়াত নেতা নজরুল বারবার আলোচিত হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে। বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য প্রতিবেদন। গোয়েন্দা সূত্রেও এর সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। জামাতের ক্যাডার নজরুল উখিয়া সীমান্তের অস্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী বলে চিহ্নিত।

সারোয়ার- মহেশখালীর অস্ত্র ব্যবসায়ী সারোয়ার দীর্ঘদিন আন্ডার ওয়ার্ল্ডে পরিচিত নাম বলে গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ।

এছাড়া চট্টগ্রামের চকরিয়া ঈদগাঁওয়ে তিন-চার জন অস্ত্রব্যবসায়ী সক্রিয় বলে গোয়েন্দা সূত্র জানায়।

ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া অঞ্চলে আনোয়ার (৪০) অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে পুলিশের তালিকায় চিহ্নিত। দু'বার গ্রেপ্তার হয়। আ.লীগ আমলে আত্মসমর্পণ করে চরমপন্থি ক্যাডারজীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবার অঙ্গীকারে। প্রকাশ্যে ওষুধ সরবরাহকারী, নেপথ্যে অস্ত্র ব্যবসায়ী। আত্মসমর্পণের আগে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ার। তার সঙ্গেই রশিদ, মোয়াজ্জেম সক্রিয়।

গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি সমুদ্র পথে মংলা বন্দরে অস্ত্রের চালান নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকজনের গ্রুপ। চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় গত ২০ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আটক হয়। এরা প্রত্যেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বলে স্বীকার করেছে। যারা অস্ত্র প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী। এ ব্যাপারে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী সাপ্তাহিক ২০০০কে গত ৫ জুলাই দুপুরে বলেন, এসব সন্ত্রাসী ইপিজেডে চাকরি নিয়ে এবং গার্মেন্টস কর্মীদের বিয়ে করে আত্মগোপন করে থাকে।

৩১ মার্চ ২০০২ রাত ৩টায় মাগুরা সাতদোহার হুমায়ুন কবীরের পুত্র কিশোর খালেদ হাসানকে ৬৪ রাউন্ড তাজা গুলিসহ পটিয়া থানার সিআই মোঃ শাহজাহান ভুঁইয়া গ্রেপ্তার করেন। এজাহারের বক্তব্য পটিয়া পৌরসভার আওতাধীন আল জামিয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রধান গেটের পাশে একটি ব্রিফকেস, একটি পলিথিন ব্যাগ ও কিছু গুলিসহ নাইটগার্ড আবদুল আলীম সন্দেহ করে ধরে রাখে। (জিডি নং -১০৬২ তা-৩১/৩/০২) এর সত্যতা যাচাইয়ে শাহজাহান ভুঁইয়া রাত ৩টায় মাদ্রাসার সামনে গিয়ে খালেদকে তল্লাশি করে ৪০ রাউন্ড তাজা গুলি পলিথিন ব্যাগে, ব্রিফকেসে ২৪টি তাজা গুলি পাওয়া যায়। এজাহার মতে এসবের মধ্যে ৬২টি গুলির পেছনে ৭.৬ লেখা, বাকি ২টি ছোট সাইজের, কিছু লেখা নেই। খালেদের ভাষ্যমতে, ২৬ মার্চ এ মাদ্রাসায় তার বাবা ভর্তি করে হাসান জামিলের (পি আশরাফ আলী, পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া যশোর) হাতে বুঝিয়ে যায়। হাসান জামিলের ঘরে কিছু ছাত্রের গোপন আলাপ এবং তার কক্ষের একটি বইয়ের তাকে এসব গুলি পেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায় মধ্যরাতে। উদ্দেশ্য বাবাকে প্রমাণ দেয়া মাদ্রসায় কি হয়। চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কক্ষে ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে খালেদ বলে তার 'হেফজ' পড়ার ইচ্ছে না থাকলেও বাবার ইচ্ছায় পড়তে আসতে হয়েছে। তাই যশোরে হাসান জামিলের কক্ষে পাওয়া তাজা গুলি বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো খালেদ।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা থেকে আটক হয় যশোরের তারেক (৪০) নিবেদিতপ্রাণ চরমপন্থি। যার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ৬টি অস্ত্রের মধ্যে তার কাছে থাকা ৪টি নতুন চকচকে অস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করে। ১টি ইটালিয়ান শটগান, ২টি রাইফেল, ১টি বন্দুক। এরকম অনেকের স্বীকারোক্তি থেকে সূত্রে প্রকাশ, চট্টগ্রাম থেকে নতুন অস্ত্র হাতে পায় তারা নিয়মিত চাহিদার ভিত্তিতে।

সূত্র মতে, মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করছে আন্ডার ওয়ার্ল্ড। এক্ষেত্রে জামায়াত এবং বিএনপি এ দু'দলের নেতৃত্ব ক্ষমতার জোরে এগিয়ে আছে।

শীর্ষ সন্ত্রাসী আজিজুল হক (ভিক্ষু হত্যা মামলার মূল আসামি), ফজল হক বাহিনীর কাছে ১০ থেকে ১৫টি একে-৪৭, এম-১৬, একে-৫৬ রয়েছে। গুড্স হিলের সামনে ২৯ মে ২০০০ ছাত্রদল নেতা নিটল হত্যার পর পর সাকা চৌধুরীর বাড়ি থেকে পাওয়া যায় বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটসহ বিপুল পরিমাণ গুলি এবং অস্ত্র। রাউজানে এদের বিশাল সশস্ত্র গ্রুপ সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সাকা চৌধুরীর ক্যাডার

চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের বেসরকারি ভিজিটরদের তালিকা

১. গাজী মোঃ শাহজাহান জুয়েল এমপি (বিএনপি)
২. মোঃ শাহজাহান চৌধুরী এমপি (জামায়াত)
৩. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (সভাপতি, জাতীয় পার্টি, চট্টগ্রাম)
৪. দস্তগীর চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, মহানগর বিএনপি)
৫. এমএ হান্নান, প্রচার সম্পাদক, মহানগর বিএনপি
৬. সাহাবুদ্দিন চৌধুরী (সভাপতি, উ.কাট্টলি, বিএনপি)
৭. আর ইউ চৌধুরী শাহীন {সাধারণ সম্পাদক (সাবেক) নগর ছাত্রদল, চট্টগ্রাম}
৮. ইয়াছিন চৌধুরী লিটন {সাংগ. (সাবেক) সম্পাদক, নগরছাত্রদল, চট্টগ্রাম}
৯. বেগম নূরে আরা সাকা এমপি (সাবেক) বিএনপি নেত্রী
১০. বেগম মনোয়ারা বেগম (জাহাঙ্গীর আলম খানের স্ত্রী)
১১. বেগম ফাতেমা বাদশা, ডবলমুরিং
১২. বেগম রাহেলা জামান, মহিলা সম্পাদিকা, নগর বিএনপি, চট্টগ্রাম

জামায়াত-বিএনপির দলীয় ব্যক্তিরাই যখন ভিজিটর : ভেতরকার আসামিদের মধ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা দলীয় আশীর্বাদে রাজকীয় সুবিধা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সিএমপি'র তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছির শিবির ক্যাডার। '৯৭ সালে যার মাথার দাম সিএমপি ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিলো। '৯৮-এর ৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের হোস্টেল এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে গ্রেপ্তার হয়। তার পর তার বোন এই গ্রুপের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে বলে সূত্রে প্রকাশ

এলাইচ ও বাচাইয়া গ্রেপ্তার হয়েছে একে-৪৭সহ।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক পানিসম্পদ মন্ত্রী এলকে সিদ্দিকী, চিফ হুইপ ওয়াহিদুল হক, বিএনপি সাংসদ এমএ জিন্নাহর পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে শীর্ষ সন্ত্রাসী ইকবাল বাহার চৌধুরী। তালিকাভুক্ত এ সন্ত্রাসীকে দলীয় ত্যাগী কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে সে সময় বিবৃতি দেন বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী। ইকবালের বিরুদ্ধে অস্ত্র, হত্যা, চাঁদাবাজির ২০টি মামলা বিচারাধীন। নজু মিয়া লেনের ফজলুল হকের পুত্র ইকবাল।

অস্ত্র অবৈধ পথে এলেও বিভিন্ন শুটিং ক্লাব এবং লাইসেন্সধারী অস্ত্র ও গুলি ব্যবসায়ীদের থেকে সহজে পাওয়া যাচ্ছে গুলি। এ সহজলভ্যতায় গুলির মূল্য মাত্র ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা। লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক কিনতে পারেন যতো খুশি গুলি। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেয় এরা, সন্ত্রাসীদের চাহিদা মতো গুলি সরবরাহও করে এরা। সব ধরনের গুলিই আগের তুলনায় এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে

২৬ জুন ২০০৩ বেলা ১টায় দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জের প্যারিস হোটেলের ১৩৯ নম্বর কক্ষ থেকে দুর্ধর্ষ এই সন্ত্রাসী একজন যৌনকর্মীসহ বিবস্ত্র অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। কোতোয়ালী থানার ওসি রুহুল আমিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এ গ্রেপ্তারের খবরে পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কায় ডিসি নর্থ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। গ্রেপ্তারের সময় ইকবাল নিজেকে পাথরঘাটা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এবং সদ্যগঠিত মহানগর ছাত্রদলের সদস্য দাবি করে বলে, 'গত রাতেও আমি প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের বাসায় গেছি।' প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে প্রকাশ, কোতোয়ালীর ওসি রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে ইকবাল- 'আমার ইজ্জত বাঁচান, অপমান করবেন না।'

সিএমপি'র তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছির শিবির ক্যাডার। '৯৭ সালে যার মাথার দাম সিএমপি ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিলো। '৯৮-এর ৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের হোস্টেল এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে গ্রেপ্তার হয়। তার পর তার বোন এই গ্রুপের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে সে সময় বন্দী দলীয় ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে নানাভাবে অঘটনের চেষ্টা চালায়। বিপজ্জনক মনে করে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কুমিল্লা জেলা কারাগারে। ১৯ অক্টোবর ২০০১ শুক্রবার দুপুরে হাজিরা দিতে চট্টগ্রাম আদালতে আসার পথে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চকবাজার শিবির অধিকৃত 'কস্তুরিকা' রেস্তোরাঁয় জুমার আগেই ঢুকে যায় নাছির। কস্তুরিকার এসি রুমে ঢুকে যায় নাছির- পুলিশ ভ্যান চলে যায় কাপাসগোলা সড়কপথে। তিনজন সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেয় কস্তুরিকার সামনে। আরেকটি মাইক্রো ও বেবিট্যাক্সিতে জন পনেরো চিহ্নিত সন্ত্রাসী নির্ধারিত কক্ষে ঢুকে ৪ ঘন্টার মিটিং শেষে আলাদা আলাদা বেরিয়ে যায় আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এই শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। নাছিরকে কারাগারে ফেরত নেয়া হয়। প্রচলিত আইন ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের বেলায় একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর বিলাসী রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন, দীর্ঘ সময়ের গোপন বৈঠক এবং প্রস্থানে প্রত্যক্ষদর্শীরা হতবাক হয়ে যান।

অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যার রায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় এ মামলার প্রধান অভিযুক্ত নাছির।

আন্ডারওয়ার্ল্ডে 'রাজাভাই' নামে পরিচিত নাছির এখন চট্টগ্রাম কারাগারে। সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর এই টপটেরর রাজকীয় মর্যাদায় আসীন বলে কারা সূত্রে প্রকাশ। তবে তার 'অসুস্থতা'র অজুহাতে হাসপাতালে ভিভিআইপি মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। ২টি সেলের মধ্যে ১টিতে নাছির একাই থাকে বলে সূত্রে প্রকাশ। যতো আসামিই থাক, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রত্যেকে নাছিরের পদধূলি নিলেই কিছুটা মর্যাদা পায়। এ পর্যন্ত যতো সন্ত্রাসী আটক হয়েছে, নাছিরের দয়া হলে তবেই কিছু সুবিধা তারা পায়। অভিযোগ আছে, নাছির ৮ মার্ডার, অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যাসহ অসংখ্য হত্যাকান্ডের পরও প্রবল শক্তিধর। এখনো নাছিরের কোনো মামলায় কঠোর সাজা হয়নি।

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে দলীয় শীর্ষ ক্যাডারদের জেলখানায় থাকাই নিরাপদ(!) মনে করছে। কারা পরিদর্শক সাতকানিয়ার সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী জামায়াত নেতা। তিনি কারাগারে নাছিরের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই নাছিরের ক্ষোভের মুখে পড়ে চরম লাঞ্ছিত হয়ে বাধ্য হন বেরিয়ে আসতে। অন্যদিকে কুমিল্লার জামায়াত সাংসদ এসে কারা অভ্যন্তরে গোপন বৈঠক করে চলে যান (নাছিরের সঙ্গে)। জেল কোডে বেসরকারি ভিজিটরদের সংরক্ষিত অধিকার বাস্তবে কতোটা অনুসৃত হচ্ছে- প্রশ্ন থেকে যায় একইভাবে ২টি মোবাইল হাতে নাছির জেলের ভেতর থেকে এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে তার সন্ত্রাসের রাজত্ব।

নাছিরে ৩৪টি মামলার বিবরণে ২টি (২৬, ৩৩) যাচাই হয়নি, ১৯ নং মামলাটি লেখা আছে 'মিল নাই', ১৮ নং মামলা অভিযুক্ত নয়, ১৬ নং মামলায় 'অব্যাহতি', ৩, ১২, ২৫ নং মামলায় খালাস, ১৩টিতে আছে হাজতে এবং ১২টিতে জামিনপ্রাপ্ত। তবে সূত্র মতে, নাছিরের জামিন জামায়াত চাইছে না।

ফটিকছড়ির অস্ত্র ব্যবসায়ী কাশেম চেয়ারম্যানের প্রাক্তন বডিগার্ড, নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর হত্যাকারী দলের সদস্য তসলিম উদ্দিন মন্টু গোপাল কৃষ্ণ মহুরী হত্যার রায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি।

২০০২ সালের ৩ জুলাই মন্টু ১টি একে-৫৬, ১টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু অস্টা পিস্তলসহ নগর গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। সঙ্গে ছিলো ১৪০ রাউন্ড একে-৫৬ রাইফেলের এবং ১৯ রাউন্ড পিস্তলের গুলি। অস্ত্র মামলায় তার ১৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। মন্টু ফটিকছড়ির ধর্মপুরের দেলোয়ার হোসেনের পুত্র। ক্রাইম জোন ফটিকছড়ির সন্ত্রাসের বরপুত্র মন্টু শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার নাছির এবং হুমায়ুনের সহযোগীও ছিলো।

হাবিব খান, যার কোনো সাম্প্রতিক ছবি পুলিশের কাছে নেই। ঘটিয়ে চলেছে একের পর এক হত্যাকান্ড। কমিশনার লিয়াকত আলী খান হত্যা, চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডার, ২৯ ডিসেম্বর ২০০১ সালে হাটহাজারী বাজারে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তুখোড় ছাত্রনেতা আলী মুর্তজার নৃশংস হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতা চলছে। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মূল আসামি হাবিব খান। অত্যাধুনিক অস্ত্রের সংগ্রহ ১০ থেকে ১২টি হাবিব খানের গ্রুপের। তার সহযোগী এবং এইট মার্ডারের আসামি সাজ্জাদ খান সিএমপির তৎকালীন এসি ডিবি মুহম্মদ মনিরুল ইসলামের দুর্ধর্ষ অভিযানে একে-৪৭সহ আটক হলেও পালাতে সক্ষম হয় হাবিব খান। এখনো প্রকাশ্যে চলাফেরা নির্বিঘ্ন তার।

হাটহাজারীর মাদ্রাসা এলাকার খাদেম আলী খানের পুত্র হাবিব খান এখন বিবিরহাট সুন্নীয়া মাদ্রাসার পাশে গ্রীনভিউ হাউজিং সোসাইটিতে থাকে।

ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবছর সপ্তাহব্যাপী ওয়াজ মাহফিল হয়। এখানেই অসংখ্য কিশোর, তরুণকে হাবিব খানের শিষ্যত্ব দিয়ে বিস্তৃত করা হয় হাবিব খান তথা শিবিরের ক্যাডার বাহিনী। গত ১৯ মার্চ ২০০৩ সিএমপি গোয়েন্দা শাখায় মুহুরী হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি শিবির ক্যাডার আজম ও সালাউদ্দিন সাংবাদিকদের এভাবেই ব্যাখ্যা করেছে তাদের সন্ত্রাসী জীবনের শুরুর কাহিনী। হাবিব খানের অপর সহযোগী শিবির ক্যাডার দেলোয়ার সাজ্জাদ খানের সঙ্গে অস্ত্রসহ আটক হলেও এখন জামিনে।

সিএমপির ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে হাবিব খানের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সখ্য। ফলে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরছে কিন্তু আটকের মুহূর্তে ফস্কে যাচ্ছে বারবার এ দুর্ধর্ষ কিলার। যার চাঁদাবাজি- সন্ত্রাসের রাজত্ব পুরো চকবাজার, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও থেকে চন্দনপুরা, আন্দরকিল্লা পর্যন্ত। অন্যদিকে তার নিজ বাড়ি হাটহাজারি পর্যন্ত। ফলে চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ এলাকায় তার প্রকাশ্য উপস্থিতি ও সন্ত্রাস এগিয়ে চলছে বীরদর্পে। অথচ পুলিশের তালিকারয় ৬১তম শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিব খান পলাতক। তার বিরুদ্ধে রাউজান থানার মং মার্ডারসহ ৪টি মামলা তালিকাভুক্ত, এতে ২টিই হত্যা মামলা।

অস্ত্র অবৈধ পথে এলেও বিভিন্ন শুটিং ক্লাব এবং লাইসেন্সধারী অস্ত্র ও গুলি ব্যবসায়ীদের থেকে সহজে পাওয়া যাচ্ছে গুলি। এ সহজলভ্যতায় গুলির মূল্য মাত্র ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা। লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক কিনতে পারেন যতো খুশি গুলি। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেয় এরা, সন্ত্রাসীদের চাহিদা মতো গুলি সরবরাহও করে এরা। সব ধরনের গুলিই আগের তুলনায় এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে। লাইসেন্সধারী অস্ত্র যদিও অধিকাংশই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে থানায় আটক, তবুও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট গ্রাহক সহজেই পেয়ে যায়।

মাত্র দেড় লাখ টাকায় মিলছে পয়েন্ট টু টু বোরের একে-৪৭ রাইফেল। বাঁটছাড়া মাত্র সতেরো ইঞ্চি, নেয়া যায় পকেটে সহজেই অথবা হাতব্যাগে। এর প্রতিটি গুলি ১০/১৫ টাকা। তবে পয়েন্ট টু টু বোরের রিভলবারের গুলিও এতে ব্যবহার সম্ভব।

গত ২৮ এপ্রিল নগরীর গোল পাহাড়ের মোড়ে দুই সন্ত্রাসী নগর গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে একটি একে-৪৭সহ। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্য মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সহজে বহনযোগ্য এবং সহজলভ্যতার কারণে চাহিদাও বেড়েছে এ অস্ত্রের। উখিয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি হয়ে মায়ানমারের সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপের মাধ্যমে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীদের হাতে ১০টির মতো চায়নিজ একে-৪৭ টু টু বোর রাইফেল ছড়িয়ে পড়েছে। এই অস্ত্রের মূল্য কিছুদিন আগেও চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা ছিলো।

৩০ রাউন্ড গুলি লোড করা যায় প্রতিটি ম্যাগাজিনে। অত্যাধুনিক অটোমেটিক এ অস্ত্রের বাহক ১টি অথবা সবক'টি- ইচ্ছে মতো ছুঁড়তে পারেন একবার অথবা একনাগাড়ে টিপে।